চাঁদের নিজের দেশে

মহাশ্বেতা দেবী

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এক জাদু-লেখক। 'আমাজনের জঙ্গলে' লিখে তিনি আমাদের মস্ত উপকার করেছেন। বইটি পড়ে জানলাম 'আমাজনই চাঁদের নিজের দেশ'। বইটি না পড়লে এর জাদু জানা যাবে না। মনে হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে বাংলা সাহিত্যের একটা মস্ত প্রয়োজন মেটাতে অমরেন্দ্র কলম ধরেছেন।

এ কথা সবাই জানেন, ছোটদের লেখার আগ্রহী পাঠক হচ্ছেন বড়রা, যাঁরা একটি ভালো ছোটদের লেখার জন্য পিপাসার্ত হয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে আমিও আছি। ভালোলাগা বই/লেখা বার বার পড়া যায়। আমি আবার খুবই দুঃখে অনুভব করি, গল্প বলার দিন এখন থাকলে প্রত্যন্ত গ্রামে আর সামান্য কিছু লোকবৃত্তে থাকলেও থাকতে পারে। গল্প বলা আর গল্প শোনার দিন চলে গেছে। মুখে বা কলমে গল্প বলা। সে গল্প শুনে বড় হওয়া। তারপর গল্পের বই পড়া। ব্যাপারটাই চলে গেল। বাড়িতে দিদিমা-ঠাকুমা জাতীয় লোকজন হয় নেই, নয় তাঁরা গল্প বলেন না। আমি শৈশবে খুব নিবিষ্ট গল্প শুনিয়ে ছিলাম। একটু বড় হয়ে খুব ভালো গল্প বলিয়ে ছিলাম। নিজের প্রশংসা নিজেই করলাম, কেন না গল্প বলা বা লেখার ব্যাপারটি বাঙালি ভুলে যাচ্ছে।

অমরেন্দ্র জাদু-গল্পকার। আমি ওঁর 'হীরু ডাকাত' 'শাদা ঘোড়া' 'গৌর যাযাবর' 'আমাজনের জঙ্গলে' ফিরে ফিরে পড়েছি। 'আমাজনের জঙ্গলে' পড়ে মনে হয়েছে, এমন নিষ্পাপ রোমান্টিকতা, শৈশবের এমন জাদুছবি, সেই সঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অমরেন্দ্র কি বিভূতিভূষণের সমান মাপের লেখক? তিনি এই সময় ও যুগের এক অন্যরকম চারণিক। তিনি তাঁর নিজের মাপের লেখক।

কিন্তু নিষ্পাপ শিশুমনকে অরণ্য, নদী ও অরণ্যসন্তানদের কাছে নিয়ে যাওয়া যে খুব দরকার, তা বুঝেই তো তিনি 'আমাজনের জঙ্গলে' লেখেন। তার মধ্য দিয়ে আজকের দুনিয়ার নির্মম সত্যও জানিয়ে দেন। অরণ্যসন্তানরা বোতোর আশ্রয়ে থাকে। গাছপালা-ফলমূলের বিষয়ে সব জানে তারা। ভারতে একজনকেই জানি, আদিবাসীদের ঐতিহ্যলব্ধ জ্ঞান নিয়ে তাঁর ভীষণ চিন্তা। অমরেন্দ্র তাঁকে জানেন না। কিন্তু তিনিও তো আমাদের না-জানা এক চিরসত্যের কথাই লিখেছেন। উবারা আকাশ-মাটি-নদী-গাছপালা পশুপাখির পাঠশালায় যে জ্ঞান অর্জন করেছে, সে জ্ঞান তো হাতিয়ার। প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে না ওরা। 'লোভ' বা 'লালসা' ওদের শব্দকোষে নেই বলেই মনে করি।

আবার এই জগৎটি তো আমাদের হাতেই বিপন্ন। ওই জঙ্গল ও নদী থেকে গল্প কথকের কাকা রত্ন আহরণ করেন। হেলিকপ্টার আকাশ থেকে অরণ্য জরিপ করে। ওই জঙ্গল ওরা কেটে ফেলবে। গল্পের কথক বালককে ওরা নিয়ে যায় জোর করে। কেন না কোনও সভ্য মানুষ কি জংলীদের সঙ্গে থাকতে পারে?

এ তো নিদারুণ সত্য। যার কথা আমি লিখি। প্রত্যহ দেখতে পাই। আমাদের আদিবাসী জগৎ সম্পর্কে অন-আদিবাসীরা কিছুই জানেন না। কেন না, তাঁরা জানতে চাননি। না জেনেই পৃথিবীজুড়ে আদিবাসী সমাজ-কৃষ্টি, বিশ্বাস-জ্ঞানকে বিনষ্ট করা হয়েছে।

'আমাজনের জঙ্গলে' সে কথাও বলা হয়েছে। আমাজন উপত্যকায় জঙ্গল ও মানুষ ধ্বংসের কাজ বহুদিন আগেই শুরু হয়েছে। অমরেন্দ্র সেদিকে শিশুদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছেন।

শিশুর মন হচ্ছে কুমারী মৃত্তিকা। অরণ্য-আরণ্য-নদী-প্রকৃতি বিষয়ে ভালোবাসা সৃজনের বীজ

শিশুমনেই রোপণ করতে হয়। তা করতে হয় গল্প বলে। বড়ই সহজ সে পন্থা। কিন্তু সহজ কাজটা করার মানুষ নেই।

আমি তো চাইব, অমরেন্দ্রর বই ও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অধুনা অ-পঠিত ক্লাসিক, এগুলির ক্যাসেট প্রবর্তন করা শুরু হোক। শিশুরা শুনুক প্রবীণ-প্রবীণাদের গলায় 'অনে-ক দিন আগে' কী হয়েছিল, সে সব গল্প। গল্পবলিয়ে মানুষ তরুণ সমাজেও অনেক। ছোট্ট পথচলতি ঘটনাকেও তাঁরা সরস বর্ণনাগুণে জমাট গল্প বানিয়ে দেন।

আর চাইব, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক। কোনও দিন কোথাও অন্য কোনও রাজ্যে কোনও ভিনভাষী শিশু আমাকে জিজ্ঞেস করুক, তুমি কি উবার গল্প পড়েছ?

সেদিন কাছে আসুক।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের কবিতার তিনটি বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বড়দের দুনিয়ায় ছোটরা যেন থেকেও নেই। সাহিত্যের জগতেও শিশুসাহিত্য নামে দিয়ে একঘরে করার সেই একই চেষ্টা। অথচ হুঁকোমুখোরাও নল্‌চের আড়াল দিয়ে হলেও ছোটদের বই না প'ড়ে পারে না। উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, অন্নদাশংকর— বাংলাসাহিত্যের মাথায় এঁদের না রেখে উপায় আছে?

ছেলেভুলোনো আর ঘুমপাড়ানোর মতলব থেকেই কি ছোটদের পাতায় আজকাল ছড়ার এত ছড়াছড়ি? কবিতার হারানো রাজ্য ছোটদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে 'আমার বনবাস', 'টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী' আর 'তালগাছের ডোঙা'।

শানবাঁধানো ইটকাঠের শহরটা ছেড়ে কবিতার কাঁধে চড়ে চলো যাই বনবাসে। 'ওগুলো কী গাছ— ফুলে ফুলে ভরা?/ দেখে লাগে যেন চিত্রিত সরা।/রাস্তার ধারে তিনটে সজনে।/বনবাসে, মন, এদের খোঁজ নে।'

'কী নাম গ্রামের? টিয়াপাখি। নদীর কী নাম? ফিঙে।' রাজার লোকেরা গাছ কেটে বন উজাড় ক'রে সুজলা সুফলা সেই গ্রামটাকে কীভাবে ব্রহ্মডাঙা করে ছেড়ে দিল, নাতি সে-গল্প শুনে/বলে: 'ও ঠাকুরদা, থামো!/এসব কথার আছে কি আর কানাকড়ি দামও?/তুমি কেন বসে রইলে? লাঠি সড়কি নিয়ে/ঝাঁপিয়ে কেন পড়নি তুমি টিয়াগ্রামে গিয়ে?'

আগে কোনও কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপনে লেখা হত: 'হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নয়' —অর্থাৎ, সংক্রমণের ভয় নেই, কেননা, হাতে নয়, পুরোপুরি যন্ত্রপ্রসূত। শহরে আজ আমরা তৈরি-করা জিনিসের ঘেরাটোপে অষ্টপ্রহর বন্দী। আলো, জল, হাওয়া— কোনওটাই প'ড়ে-পাওয়া প্রকৃতিদত্ত নয়। ঠিক তখনই মনে হয়: 'ঘরের মধ্যে নদী নেই, বারান্দায় সাগর নেই,/ছাদে কোনো পাহাড় নেই, এ কি একটা বাড়ি?' কী শহর! কী তার ছিরি! 'ছাগল বোঝাই লরি—/লাগল বুঝি? সরি।.../ঝেঁটিয়ে বিদেয় করুন তো/ ছোরা বন্দুক বোমা।'

এরপর 'সাধু, সাধু' বলতে খুব ম্যাড়মেড়ে লাগে। হাততালির কমে মন ওঠে না।

চারদিকে ভালোবাসার দুর্গ

পবিত্র সরকার

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কয়েকটি বই পড়ে মনে হল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অদৃশ্য হাত রেখেছেন এই লেখকের মাথায়, প্রতিবেশিনী লীলা মজুমদার যেন অসুস্থতা থেকে উঠে এসে তাঁর পিঠে রেখেছেন আরেকটি হাত। নইলে ছড়ায় রূপকথায় গল্পে অসামান্য মনোরম কল্পনায় এবং শিশুরঞ্জক এমন চমৎকার ভাষায় নিজেকে এমন মেলে ধরলেন কী করে অমরেন্দ্র? তারিখ অনুযায়ী দেখছি ১৯৯১-এর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে বেরিয়ে গেছে তিনটি বই— 'গৌর যাযাবর' 'হরিণের সঙ্গে খেলা' আর 'পাখির খাতা'। শেষ বইটি ('আমার বনবাস') বেরিয়েছে গত জানুয়ারির বইমেলায়। লেখা বেশ কিছু আগের, পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল ধারাবাহিক হিসেবে। তখন তো দেখা হয়নি, কিন্তু এখন পড়ে মনে হল, পনেরো-ষোল বছর পরেও এ লেখাগুলি ঝকঝকে তাজা রয়েছে।

'হরিণের সঙ্গে খেলা' (যুগান্তর, ১৯৮০) চমৎকার ইচ্ছাপূরক গল্প, ধাঁচটি রূপকথার। কুশ নামে একটি ছেলের বুন্যা নামে একটি হরিণের সঙ্গে বন্ধুত্ব। সেই গভীর বন্ধুত্বের সূত্র ধরে কুশের হারিয়ে যাওয়া (আসলে অত্যাচারী রাজার সৈন্যদের হাতে বেগার খাটার জন্য বন্দী) বাবা-মার উদ্ধার, হরিণবাহিনীর হাতে রাজার সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ পরাজয়— এই হল গল্প। আসল গল্পটায় যদি ওই রোমহর্ষক যুদ্ধটুদ্ধ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন অমরেন্দ্র, তাহলে তা খানিকটা মামুলি হয়ে উঠত। কিন্তু তাঁর ঝোঁক সেদিকে ছিল না, বরং তিনি অনেক বিস্তারিত করে, খুব মমতা দিয়ে বলেছেন মানুষ আর পশুর বন্ধুত্বের কথা, মানুষের দয়ামায়া-বেদনার কথা। আর, রাজাকে হারিয়ে দেওয়ার পর রাজা-হওয়ার-ইচ্ছে-ছুঁড়ে-ফেলে দেওয়া কুশ আর বুন্যার আনন্দময় খেলা আর বন্ধুত্বের আরও বেশি খবর। ওইখানে গল্পটি হয়ে উঠেছে এক মানবিক আলেখ্য, নিছক ভালো গরিব আর দুষ্টু রাজার লড়াইয়ের গল্প থাকেনি।

আমি 'গৌর যাযাবর' আর 'পাখির খাতা'— এ দুটির মধ্যে কোনটিকে সবচেয়ে ভালো বলব, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় থাকি। দুটিই অসাধারণ। প্রথমটিতে এক বাউন্ডুলে গান-গেয়ে-ঘুরে-বেড়ানো রাখালের গল্প, ঠিক ইচ্ছাপূরক নয়, যদিও তার শেষে গৌর বলছে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে যাবে, লেখাপড়াও শুরু করবে। সাহাদের গরু চরায় গৌর, তাদের মধ্যে একটি গরু বুধা তার বন্ধু। একদিন সন্ধে পেরিয়ে গেল। গরু গোয়ালে তোলা হল না, ফলে বেদম মার খাওয়ার সুলভ সম্ভাবনা দেখে গৌর সাহাবাবুদের আশ্রয় ছাড়ল। তারপর শুরু হল তার বিচিত্র মানব-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক মহৎ যাত্রা। বদরাগী বাপ স্নেহশীলা মা আর দুই কমবেশি বিচ্ছু ছেলের বাড়িতে প্রথমে, তারপরে সাপে-কাটা মৃতের ভেলায় 'শবদেহে'র সঙ্গী হওয়া এবং শবের বেঁচে-ওঠা, এবং সেখানে জল-পুলিসবাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তারপরে দিল্লি রোডের ধারে এক জঙ্গলে দুই পকেটমার ভাইয়ের সঙ্গে দু-দিন, শেষে এক উদাসী পাগল যুবককে সুস্থতায় ফিরিয়ে আনা— গৌর যেন মার্ক টোয়েইনের সেই চরিত্রের মতো সবার ভালো দেখে, সবার ভালো করে। স্পর্শমণি যেন সে— মানুষকে সোনা করতে করতে এগিয়ে যায়। অমরেন্দ্র গরিব গ্রামীণ জীবনকে বড় ভালো চেনেন, বড় গভীর বেদনা নিয়ে তাদের কথা বলেন, ফলে মাঝে মাঝেই গুরুগম্ভীর প্রবীণ পাঠকও গৌরের গল্পে বুকের মধ্যে হু-হু করা এক দুঃখ, চোখের পাতা ভারি হওয়ার বোধ এড়াতে পারেন না।

'পাখির খাতা' — আবার গল্প ছেড়ে অমরেন্দ্র চলে আসেন ছোট ছোট ছবিতে - পাখিদের ঘরসংসারে ঢুকে পড়ে তাদের মুখের ভাষাটিকে পর্যন্ত তুলে আনেন তিনি। পাখিদের ভাষায় 'সাকট্টম' যে আসলে

'স্বাগতম', 'ছার্চোপ্পর' যে 'স্বার্থপর', 'টানমম্বার' যে 'ডায়মন্ডহারবার' তা অমরেন্দ্রর দোভাষিতা ছাড়া আমরা কি জানতে পারতাম? পরিযায়ী পাখিরা তাঁকে খবর দেয় যে তাদের 'জম্মট্টান উজবেকিট্টান' আর শান্তিনিকেতনের পাখিরা তাঁকে গান শোনায় 'অমানডের শান্টিনিটিন'। অমরেন্দ্র আমাদের সেই অলৌকিক সময়ে নিয়ে যান যখন মানুষ আর পশুপাখি সকলে এক বন্ধুত্বের সূত্রে গাঁথা ছিল। যখন সকলে সকলের ভাষা বুঝত। এমন বই বাংলায় তো আর লেখাই হয়নি।

'তালগাছের ডোঙা' আর 'আমার বনবাস' ছড়ার বই। প্রথমটিতে আছে আলাদা-আলাদা ছড়া, দ্বিতীয়টিতে একটানা ভ্রমণের ছড়া। যাঁরা 'হীরু ডাকাত' পড়ছেন তাঁরা সকলেই জানেন ছড়ার ছন্দ অমরেন্দ্রর হাতে কীরকম নেচে চলে, সেই 'হীরু ডাকাত'কেও একটি ছড়ায় পাওয়া যাবে প্রথম বইটিতে। এখানেও আছে নানা পশু-পাখি বৃক্ষ-লতার কথা, নদীর কথা। উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করা যাবে না ভেবে উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে হচ্ছে। 'আমার বনবাস'-এ বিশেষ করে আছে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার ডাক, বাংলার বনে-পাহাড়ে বেড়িয়ে আসার ডাক। এতেও আছে অনেক মানুষ আর ঘটনার ছবি। ছত্রে ছত্রে দেশের গরিব মানুষ ও শিশুদের জন্য তাঁর দুঃখ ঝরে পড়ে।

সবকটি বই ঝকঝকে চমৎকার ছাপা, আর ছবি এঁকেছেন দেবব্রত ঘোষ, দেবাশিস দেব আর যুধাজিৎ সেনগুপ্তের মতো শিল্পীরা। চারপাশের সিনেমা-টেলিভিশন-খবরের কাগজের খুনজখম দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঝগড়াঝাঁটির বাতাবরণে অমরেন্দ্রর এই বইগুলি আমাদের সন্তানদের চারদিকে ভালোবাসার এক দুর্গ তৈরি করবে, এ আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস। এ বইগুলির লেখককে আমি এখনকার এক বরণীয় শিশু-সাহিত্যিক বলে মনে করি।

শৈশবের আনন্দসঙ্গী

ওমর কায়সর

পাঠাভ্যাসের দিক থেকে এই পরিণত বয়সেও শিশুকালটা পেরতে পারলাম না। আমি শিশুসাহিত্যের নিয়মিত পাঠক। শৈশবের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শিশুসাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার যৌবনে কিংবা তারও পর। বাকি যেটুকু জীবন আছে তাতেও মনে হয় এই অভ্যাসটা বদলাতে পারব না। এখনও চোখের সামনে কেউ যদি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা', 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', 'ছেলেদের মহাভারত', লীলা মজুমদারের 'হলদে পাখির পালক', আল মাহমুদের 'পাখির কাছে ফুলের কাছে', শাহিরয়ার কবিরের 'নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়', জাফর ইকবালের 'দীপু নম্বর টু' এনে তুলে ধরে আমি আবার লুফে নেব। এগুলো একাধিকবার পড়েছি। কিন্তু প্রতিবারই মনে হয়েছে নতুন একটা জগতে ঢুকলাম। শিশুসাহিত্যের ভাষার যাদু দিয়ে, নরম, কোমল শব্দের গাঁথুনিতে যে নিখুঁত নির্মল জলছবি আঁকা হয়, তাতে মনের মধ্যে এক শান্তির আমেজ আসে। এই মনোরম বিনোদনের মোহে আমি বার বার শিশুসাহিত্যে মগ্ন হই। এগুলো আমার কাছে প্রিয় কোনও প্রচলিত গানের কলির মতো। বার বার শুনি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'পাখির খাতা' কুড়ি বারের অধিক পড়েছি। পড়ে শুনিয়েছি বহুবার স্কুলের শিক্ষার্থীদের। অথচ এই বইটি আমার হাতে এসেছে শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণের পর। তারপরও বইটি যেদিন হাতে পেয়েছি, সেদিন বারো বছর বয়সী কিশোরের আনন্দ অনুভব করেছি। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমি যেন শিশুকালটায় ফিরে গেছি। কারণ এর একটা বিশেষ মনস্তত্ত্ব আছে। ছোটবেলায়

পাখির গান কিংবা ডাক আমরা নিজেদের ভাষায় একই রকম সুরে বলতাম। যেমন বউ কথা কও। দাদির কাছে শুনতাম এই পাখি কাঁঠাল পাকানোর গান ধরেছে, তার ডাকের মানে হল— কাট্টল পাগো (কাঁঠাল পাকো)। চট্টগ্রামের মানুষ এমনটি ভাবে, বাংলাভাষায় এর সংস্করণ হচ্ছে অভিমানী বউয়ের মান ভাঙানো— বউ কথা কও। আবার পাহাড়ি অঞ্চলে শুনি এই পাখির ডাক— বিজু এজো (বিজু মানে নববর্ষের উৎসব, এজো মানে আসো)। 'পাখির খাতা' বইটির এক ডজন গল্প সবই পাখিদের কথাবার্তা নিয়ে। কল্পনার কী অপরিসীম বিস্তার। আমাদের অবাক করে দিয়ে পাখিরা এখানে মানুষের মতোই কথা বলে।

প্রথম গল্প 'খুঁজে দেখ, বুঝে দেখ'। এ-গল্পের শুরুতেই লেখক বলে দিয়েছেন, 'পাখি নাকি কথা বলে না? সব পাখিই কথা বলে। ওই যে টুঁই-টুঁই-টুঁই-ট্ট, কিঁও-কিউ-কিঁও, নুপুর-নুপ নুপুর নুপ করে শব্দ করে ওগুলো তবে কী? ওগুলোই ওদের কথা। ওদের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না বলে আমরা সবজান্তার মতন বলি পাখিরা কিচিরমিটির লাগিয়েছে। তুমি কি মাদ্রাজের লোকেদের কথা বুঝতে পারো? দুটো গ্রিক ছেলে মার্বেল গুলি নিয়ে ঝগড়া করলে তুমি কি তা বুঝতে পারবে? অতো দূরে যাবারই বা দরকার কী। চার-পাঁচজন চাটগাঁর লোক নিজেদের মধ্যে মনের খুশিতে কথা বলছেন, তাও কি বুঝতে পারবে?'

গল্পের প্রথম অংশের এইটুকু পড়েই মায়ায় জড়িয়ে পড়লাম। আমাদের চট্টগ্রামের কথা আছে, তাই। পাখিদের কিচিরমিচির কিংবা নানারকম ডাক দিয়ে পাখিরা আসলে কী বোঝাতে চায়, তা ছোটরা এই বইতে পেয়ে যাবে। পাখিরা যখন সাকট্টম সাকট্টম বলে ডাকে, তখন তারা আসলে বলতে চায়— স্বাগতম স্বাগতম। তীব্র গরমে দুটো কাক একসঙ্গে গর্তের জলে একবার করে মাথা ডোবায় আর এই কাকস্নানের আরামে বলে— আ আ!

পাখির নানা মজার কথায় ভরা এই বইটি। যারা পাখিদের ভালোবাসে তারাও এই বইটিকে ভালোবাসবে। আর যারা পাখিদের কথা আগে তেমন করে ভাবত না, তারা এই বইটি পড়ে পাখিদের ভালোবাসতে শুরু করবে।

পাখির খাতার গল্পগুলোর নাম 'খুঁজে দেখ, বুঝে দেখ', 'সাকট্টম', 'ছার্চোপ্পর', 'কেমনজা কেমনজা', 'পাখির রামায়ণ', 'জন্মট্টান উজবেকিট্টান', 'পাখির কষ্ট', 'শান্টিনিটিন', 'জোছনা ছোঁয় না', 'শালিখের অসুখ', 'পাখির রাগ' এবং 'পাখির খাতা'। বইটির ভেতরের ছবি আর মলাট এঁকেছেন দেবব্রত ঘোষ। পাতা উল্টাতে উল্টাতে ছোটরা লেখার মজা নেবে, নাকি ছবি দেখবে বুঝে উঠতে পারে না। এত সুন্দর ছবি। পাখিদের আনন্দ, পাখিদের কষ্ট, পাখিদের আলাপসালাপ, সব মিলিয়ে এই বইটা রূপকথার গল্পের চেয়েও মজার মনে হয়।

কবি, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক, পর্যটক, ভ্রমণলেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সৃজনশীলতার একটা বড় অংশ হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট শিশুসাহিত্য। যে সাহিত্য চিরকাল শিশুদের মনকে আলোকিত করে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলে, শিশুকে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, পাশাপাশি বড়দের মনের খোরাকও যোগায় এবং প্রচ্ছন্নে বড় কোনও কিছুর ইঙ্গিত বহন করে, সেগুলোই চিরায়ত শিশুসাহিত্য। সেগুলো শিশুর মানস গঠনে চিরকাল অবদান রাখে, যার আবেদন বহুকাল পর্যন্ত থাকে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সেরকম চিরকালের শিশুসাহিত্যের এক বিরল লেখক। যাঁর সৃষ্টির রথ এখনও সচল।

ছোটদের জন্য অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা প্রথম বইটি 'শাদা ঘোড়া'। প্রথম বইতেই পৃথিবীর বহু শিশুকে গল্প বলার জাদুতে তিনি মোহগ্রস্থ করলেন। এরপর একের পর এক তিনি লিখেই গেছেন— 'হীরু

ডাকাত', 'গৌর যাযাবর', 'পাখির খাতা', 'ঋষিকুমার, 'তালগাছের ডোঙা', 'লিচুবাগানের চৌকিদার', 'টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী', 'আমার বনবাস', 'হরিণের সঙ্গে খেলা', 'ছেঁড়াকাঁথার গল্প', 'ভূতের বাঁশি', 'আমাজনের জঙ্গলে', 'বরফের বাগান', 'গরিলার চোখ', 'দুরুদুরু', 'চাঁদের তাঁবু' ইত্যাদি।

তাঁর 'গৌর যাযাবর' একটি ধ্রুপদী গ্রন্থ। যেখানে হারিয়ে যাওয়া সমৃদ্ধ বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং মানুষের আচরণকে খুঁজে পাওয়া যায়। শব্দের পর শব্দ দিয়ে চারপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশের এমন নিখুঁত ছবি সত্যিই খুব কমই দেখা যায়। দুনিয়া দেখতে গিয়ে গৌর আসলে মানুষের ভালোবাসাই পেয়েছে। আর তার চোখ দিয়ে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন প্রাচীন বাংলার নানা জনপদ। এই বইয়ের আরেকটি বড় সম্পদ গৌরের গানগুলো। এগুলোতে আছে লোকগানের আমেজ। কথাসাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হলেও তিনি যে একজন কবি তা বোঝা যায়। কারণ এখানে 'তালগাছের ডোঙা'র রচয়িতাকেও খুঁজে পাওয়া যায়। ছোটদের জন্য লেখা এই কবিতার বইটিও যুগ যুগ ধরে পাঠকপ্রিয়তা পাবে। ছোটবড় যেসব পাঠক কিশোর কবিতা পড়তে অভ্যস্ত তারা এই বইটাতে চোখ বুলালেই বুঝতে পারে এর লেখাগুলো অন্যরকম। পদ্যগুলোতে গল্পের আমেজ। যেন তিনি মস্ত একটি তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসে একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন। পদ্যের মধ্যে গল্পের মেজাজ, কথা বলার ঢং। পড়তে পড়তে মনে হয় যিনি পদ্য দিয়ে গল্প বলছেন তিনি আমার সামনেই উপস্থিত আছেন। ছোটদের জন্য লেখার মধ্যে এই গুণটা খুবই প্রয়োজনীয়।

'তালগাছের ডোঙা'র প্রথম কবিতাটির শুরুই হয় এইরকম:

আমার ছিল তেঁতুলগাছ আর তেঁতুলগাছে ছিল পোষা বাঁদর।
বর্ষাকালে বাঁদরটাকে ছাতা দিতাম, শীতের দিনে দিতাম তাকে চাদর।
গাছটা যে ঠিক আমার ছিল— তা হয়তো না, ছায়াটা ছিল আমার।
আমার সখা ছিল গ্রামের বারুই, কুমোর, কামার।

যত দিকের যত রাস্তা, ভেবে নিতাম— সবই আমার নিজের।
বিকেলবেলা কাটতো আমার ইস্টিশানের ব্রিজে।
কত দূরের ট্রেন আসতো, যাবে কতই দূরে—
জানলা-দুয়ার কাঁপতো ট্রেনের শব্দে— বারুইপুরে।

আরেকটি কবিতায়:

আমার একটা ডোঙা ছিল—
তালগাছের ডোঙা।
'ডোঙা' তোমরা বুঝলে না তো? নৌকো, নৌকো, নৌকো।
হুবহু ঠিক নৌকোও নয়, নৌকোর আত্মীয়।
ডোঙা আমার বড্ড ছিল প্রিয়।

ডোঙা থাকলে খালও থাকে,
আমার ছিল খাল।
আমার বন্ধু ছিল গ্রামের হাত-কাটা রাখাল।

আমার শুধু মনে পড়ে না
বাঁশিও ছিল কিনা।
চুরি করার ইচ্ছা ছিল
সরস্বতীর বীণা।

দারুণ ছন্দ আর অন্ত্যমিলে তিনি শব্দের যাদুতে মোহগ্রস্ত করে রাখেন পাঠকদের। এই বইয়ের একটি মজার পদ্যের নাম 'ছেলেটা'। ছোটবেলায় খেলার সময় আমরা নানা রকম ছড়া বলতাম মুখে মুখে। একটা শব্দের সঙ্গে আরেকটা শব্দের মিল ঘটিয়ে, কিংবা একটা চরণের সঙ্গে আরেকটা সামঞ্জস্য রেখে ছড়াগুলো বলতাম। এই দীর্ঘ ছড়াটিও তেমনই। তবে এখানে গাঁয়ের দরিদ্র একটা ছেলের সঙ্গে এক শহুরে ভদ্রলোকের অবজ্ঞাভরা কথোপকথন। পদে পদে চমৎকার শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্য ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। ছোটদের কাছে খুব জনপ্রিয় এই ছড়াটির কিছু পংক্তি তুলে ধরছি।

'এই ছেলেটা, নাম কী রে তোর?'
'সামকিডাঙায় দেখেছ ভোর?'
'সামকিডাঙা? সেটা কোথায়?'
'যাওনি বুঝি চিংড়িপোতায়?'
'চিংড়িপোতা? কোথায় সেটা?'
'দেশ দেখনি, আপনি কেটা?'
'এই বুঝি তোর কথার ছিরি?'
'অকাট মুখ্যু ও মিস্তিরি।'
'তবু যা হোক, বিনয় আছে!'
'ছাগল আজ্ঞে ফলে গাছে?'
'কে ছাগল? বল— তুই না আমি?'
'দাঁড়ান, আগে নিচে নামি।'
'বল, কথাটার বল কী মানে?'
'শোনেননি কি গল্পে-গানে?'
'জানিস, আমি কে তুই জানিস?'
'ধরতে বললে বেঁধে আনিস!'
'তুই-তোকারি! দেখাই, দাঁড়া।'
'দৌড়ে আসবে গোটা পাড়া।'
'ভয় দেখাস যে! জানিস আমি—'
'ভদ্রলোক আর মুই ঘরামি।'

অমরেন্দ্র কবি, ছোটদের জন্য পদ্য কিংবা বড়দের জন্য কবিতা লিখছেন। কিন্তু গদ্যেও তাঁর কবি সত্তার প্রবল প্রতাপ। ছোটদের জন্য লেখা গদ্যগুলো কবিতার মতো ব্যঞ্জনাময়।

এক জাদুকরের গল্প

খন্দকার মাহমুদুল হাসান

জাদুকরেরা ছাড়া আর কেউ তো জাদু জানে না, তাই তারা অন্যদের থেকে আলাদা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এমন এক মানুষ, যার ভাষায় জাদু আছে, কথায় জাদু আছে, যার হাতে আছে এক জাদুর কলম। সেই কলম দিয়ে ছোটোদের জন্যে তিনি যা লেখেন তাই মোহাবিষ্ট করে ফেলে। কথাগুলো বললাম এই গুণী লেখকের একজন পাঠক হিসেবে, তাঁর শিশুসাহিত্যের বই পড়ে। আমার বিশ্বাস, তিনি জাদুকর ছাড়া আর কিছু নন। তিনি যে শুধু শিশুসাহিত্যিক তা তো নয়; তিনি কবি, তিনি গল্পকার, তিনি ঔপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী, সম্পাদক, পরিব্রাজক, আরও কতকিছু। সবদিকেই তিনি অনন্য। কিন্তু আমি তাঁর শিশুসাহিত্য নিয়ে কথা বলছি। পড়ে বলছি। বানিয়ে বলছি না একটুও।

'শাদা ঘোড়া'র কথাই ধরি। সেই ঘোড়াটাকে বিজয় পেয়েছিল মাতলাগাঙের ওপারে মাঠের মধ্যে একটা খাদ থেকে। পাওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই ওর গায়ের রং আরও ধবধবে হল। কপালের মাঝখানের বাদামি দাগটা আরও অনেক সুন্দর হল। বিজয় ওর নাম রাখল শাদাপাল। এরপর থেকে ঘোড়াটা ওর নিত্যসঙ্গী।

মল্লিকবাবুদের বাড়ির গরু চরিয়ে সন্ধেবেলায় ফেরার সময় বিজয়ের কাঁধে ঝোলানো ঘাসের পুঁটলি দেখে শাদাপালের খুশি দেখে কে! একদিন রাজাবাবু বিজয়কে ডাকিয়ে এনে শাদা ঘোড়াটা কিনতে চাইলেন। তাঁর মেয়ে টুকটুকের বেড়ানোর জন্যে ঘোড়াটা চাই। সকালে কাজে যাবার সময় ঘোড়াটা রেখে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যেতে বললেন। বিজয় জানে, রাজাবাবুর যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন তিনি শাদাপালকে নিয়েই ছাড়বেন। কিন্তু ওকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারবে না।

তাই নিশুতি রাতে আকাশের তারা ছাড়া যখন কেউ জেগে নেই তখন শাদাপালকে নিয়ে গ্রাম ছাড়ল বিজয়। কিন্তু ভোর হতেই রাজবাড়ির পেয়াদারা ধরে ফেলল তাকে। কিছুটা পথ নিয়ে গিয়ে ঘাড়ে রদ্দা কষে ওকে তাড়িয়ে দিয়ে শাদাপালকে নিয়ে গেল রাজবাড়িতে।

সুপুরি গাছের বলয় দেখে বছর গুণতে জানত সে। তার জন্মের বছর হয়েছিল সেই গাছ। তার মা মারা যাওয়ার সময় গাছটায় বলয় ছিল পাঁচটা, আর বাবা মারা যাওয়ার সময় বলয় ছিল সাতটা। শাদাপালকে নিয়ে বাড়ি ছাড়ার সময় বারোটা বলয় ছিল। এবারে সে প্রতিজ্ঞা করল, ষোলোটা বলয় পূর্ণ হবার আগেই রাজাকে পথের ধুলোয় শোয়াবে।

শাদা পালকে হারিয়ে হতাশ বিষণ্ণ বিজয় পথে দিশাহারা বসে থাকতে থাকতে শাদা পালের হ্রেষাধ্বনি শুনে উৎকর্ণ। কাকতালীয়ভাবে রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে এল শাদাপাল। তারপর বিজয়কে নিয়ে ছুট লাগিয়ে বহু-উ দূরে তিনদিকে নদী দিয়ে ঘেরা এক গাঁয়ে এসে থামল। সেখানে এক বুড়ির সঙ্গে তার দেখা হল। তার কাছেই জানল, মড়ক লেগে সেখানকার গরু-বলদ প্রায় সবই মরে যাওয়ায় চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ দুধও খেতে পায় না। নদীর মাছ, শাকপাতা আর ডাব খেয়ে কোনও রকমে মরতে মরতে বেঁচে আছে হাড়-জিরজিরে কিছু মানুষ।

গরুর রোগবালাইয়ের যে চিকিৎসা রাখাল বিজয়ের জানা ছিল তার ওপর নির্ভর করে সে লতাপাতা আর শেকড়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট গরুগুলোকে সারিয়ে তুলল। গ্রামে এল নতুন জীবন। গ্রামবাসী তাকে মাথায় তুলে নিল। এবারে সে তাদেরকে নিজের জীবন কাহিনি খুলে বলায় বিজয়ের গাঁয়ের সেই রাজার সঙ্গে এই গ্রামের লোকেরা যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করল।

বুড়ির সাহায্য নিয়ে যুদ্ধের অস্ত্রের সন্ধানে বাঁশের ভেলায় চেপে সাতদিন সাত রাত দাঁড় বেয়ে শাদাপালকে সঙ্গে করে তিরন্দাজদের দেশে গেল সে। বুড়ির কাছেই সে শুনেছিল, তিরন্দাজেরা তাদের দেশে বিদেশিদের দেখলেই মেরে ফেলে।

তিরন্দাজেরা ঠিকঠিকই হামলা চালাল। তিরবিদ্ধ শাদাপালসহ বিজয়কে ঘিরে ফেলল তারা। কিন্তু গাছের পাতার রস লাগিয়ে চিকিৎসা করে শাদাপালের ক্ষত সারিয়ে তুলে সম্মান জানাল। সেদেশের রাজা জানালেন, শাদা ঘোড়া তাদের দেবতা। এবারে রাজাকে নিজের জীবনকাহিনি খুলে বলায় রাজা তাকে একশো ধনুক ও একশো তির আর বাঁশি দিলেন। তাই নিয়ে শাদাপালসহ বুড়ির গ্রামে ফিরে এল সে। তারপর একদিন দলবেঁধে তির-ধনুক নিয়ে রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

রাজার পেয়াদারা মস্ত-মস্ত তির-ধনুক দেখে থমকে গেল। বর্শা হাতে বেরিয়ে আসা রাজার বুক ঘেঁসে তির ছুটে গেল। রাজা পথের ধুলোয় লুটিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন।

শাদাপালকে ছুটিয়ে রাজার কাছে গিয়ে রাজাকে ধুলো থেকে তুলে রাখাল বিজয় ঘোষণা করল যে, তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। এবারে রাজা খুশি হয়ে অতিথি হিসেবে বরণ করে নিলেন। বিজয়কে নিয়ে অন্দরমহলে গেলেন। রানিমা তাদের মেয়ে টুকটুককে তুলে দিলেন বিজয়ের হাতে। এরপর টুকটুককে নিয়ে শাদাপালের পিঠে চড়ে সে রোজ বেড়াতে যায়। মন খারাপ হলে দূর মাঠে গিয়ে আপনমনে বাঁশি বাজায়।

এই হল শাদা ঘোড়ার গল্প। যেন রূপকথা। কিন্তু অলৌকিকত্বের প্রতাপ তেমন নেই। এখানে রোগের চিকিৎসা জাদুমন্ত্রবলে হয় না। হয় গাছপাতার রসে, ভেষজগুণের ব্যবহার করে। এখানে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে দৈত্যদানব লাগে না, মানবীয় শক্তিতে অশুভের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় মানুষ। অলৌকিকতার ছোঁয়া ছাড়াই মর্ত্যের মানুষের লৌকিক শক্তির বিজয়ের কথা শুনতে পাই আমরা। আর ভাষা? সেকথা আর বলব কী! একেবারে কোমল মধুমাখা। বিজয়ের মা-বাবার ঘুমিয়ে পড়াটা যে চিরনিদ্রা তা বোঝা যায় 'আর উঠল না' দেখে। এ বড়ই চমৎকার উপস্থাপন-কৌশল। বাক্যগুলো সহজ-সরল। কঠিন শব্দ ও যুক্তাক্ষর যতটা সম্ভব দূরে রাখা হয়েছে। পড়ার সময় মনে হয় যেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পাশে বসে গল্প শুনছি। তাঁর সঙ্গে গল্প করার সময় যা মনে হয় ঠিক তেমনই মনে হয় এই গল্প পড়ার সময়ও। এ তো পড়া নয়, যেন শোনাও। লীলা মজুমদার যথার্থই বলেছিলেন, এই লেখকের 'শাদা ঘোড়া' পড়ে ভেবেছিলাম কি ভালো কি ভালো!' অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের দ্বিতীয় বই 'হীরু ডাকাত' পড়ে বলেছেন, 'এ যে আরও ভালো, মনকে নাড়া দেয়। রূপকথার রূপ ধরে ইতিহাস কথা কয়।'

(সূত্র: লীলা মজুমদার, রূপকথার রূপ ধরে ইতিহাস, আজকাল, কলকাতা, ১৯ মে ১৯৮৭)

শিশুসাহিত্যের যে নিজস্ব রূপ থাকতে হয় তা বোঝা যায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা পড়ার সময়। তাঁর নিজস্ব ভাষা দেখেই চিনে নেওয়া যায়। একজন সাহিত্যিকের জন্যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবনীন্দ্রনাথকে চিনি তাঁর ভাষা দেখেই। চিনি উপেন্দ্রকিশোরকেও। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকেও স্পষ্টভাবে চেনা যায় তাঁর ভাষাতেই। এ যেমন পদ্যে, তেমনি গদ্যেও। যাঁদের তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে, কিংবা শ্রবণ-মাধ্যমে তাঁর বাক্য-গঠন শৈলী সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ হয়েছে, তাঁরা এ বই পড়লে বুঝতে পারবেন যে নিজস্ব কথনরীতিকে সাহিত্যে রূপান্তরের দক্ষতা তাঁর কতটা। এই ভাষায় মায়া আছে। এই ভাষায় জাদু আছে।

'তালগাছের ডোঙা' বইটা তিনি আমায় ভালোবেসে উপহার দিয়েছিলেন। তাতে আছে–

আমার একটা ডোঙা ছিল–
তালগাছের ডোঙা।
'ডোঙা' তোমরা বুঝলে না তো?
নৌকো, নৌকো, নৌকো।
হুবহু ঠিক নৌকোও নয়, নৌকোর আত্মীয়।
ডোঙা আমার বড্ড ছিল প্রিয়।

আহা কী প্রাণ ছুঁয়ে যাওয়া ভাষা! লোকজ জীবনের প্রতি কী দারুণ টান!

'আমাজনের জঙ্গলে' হারিয়ে যাওয়া এক শিশুর সন্ধান মেলে তাঁর সাহিত্যে, যে এক বনবাসী শিশুর সঙ্গে ছবির ভাষায় কথা বলে, অর্থাৎ ছবি এঁকে এঁকে তার সঙ্গে প্রকাশ করে মনের ভাব। শিশুটিকে ছবিতে সে তার শহর দেখায়, যে শহরে শুধুই দালানকোঠা, কোনও গাছপালা নেই, নদী নেই। বনবাসী শিশুটি ভাবে এটা বালির শহর, মানুষের নয়। কারণ, গাছপালা আর প্রকৃতি ছাড়া মানুষ কি বাঁচতে পারে? এভাবে তিনি প্রকৃতির জন্যে তাঁর মনে যে ভালোবাসা আছে তা সঞ্চার করেছেন পাঠকের মনেও। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন, নিষ্পাপ শিশুমনকে অরণ্য, নদী ও অরণ্যসন্তানদের কাছে নিয়ে যাওয়া যে খুব দরকার, তা বুঝেই তো তিনি 'আমাজনের জঙ্গলে' লেখেন।

(সূত্র: মহাশ্বেতা দেবী, চাঁদের নিজের দেশে, আজকাল, কলকাতা, ২০ জুলাই ২০০২)

'বরফের বাগান', 'ঋষিকুমার', 'গৌর যাযাবর', 'গরিলার চোখ', 'মাতলাগাঙের ভূত', 'লিচুবাগানের চৌকিদার', 'ছেঁড়াকাঁথার গল্প', 'পাখির খাতা', 'তালগাছের ডোঙা', 'হরিণের সঙ্গে খেলা', 'টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী', 'জল-বাতাসা', 'ভূতের বাঁশি', 'আমার বনবাস', 'চোখে দেখা গল্প' প্রভৃতি বই তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্যে। কী গদ্যে, কী পদ্যে এক আশ্চর্য চৌম্বক-শক্তি আছে তাঁর ভাষায়, যা আটকে ধরে রাখে পাঠককে। সেই ভাষা একান্তই ছোটদের।

'হীরু ডাকাত'-এ যে পদ্য তারও আছে নিজস্বতা। এতে তিনি বলছেন–

দস্যুর দল তিন ছেলেকে বাঁধল গাছের গোড়ায়
পাঁচজনে লাফ দিয়ে উঠল পাঁচটি কালো ঘোড়ায়
উনিশজনের হাতে জ্বলছে মশাল।
এসব কবে ঘটছে জানো? সেটা উনিশশো সাল।

এতে স্পষ্ট যে, এই ঘটনার মধ্যে ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস একজন ডাকাতের। যে ডাকাতের মনটা বড়ই নরম। গরিবের দুঃখে যার কেঁদে ওঠে প্রাণ। যে মন্দ লোকের ত্রাস, কিন্তু বন্ধু দরিদ্রের। লুটে নেওয়া ধন সে বিলিয়ে দেয় গরিবদের মধ্যে। তাদের দরজায় রেখে আসা সম্পদে অভাব ঘোঁচায় দীনহীনেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হীরু ডাকাতের পরিণতিটা হয় করুণ। হীরু একজন ডাকাত। কাহিনির যবনিকায় তার জীবনেরও যবনিকা নেমে আসে। আমাদের প্রাণ যে কেঁদে ওঠে এই ডাকাতের জন্যে তার কৃতিত্ব অর্থাৎ আমাদেরকে কাঁদানোর কৃতিত্ব অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর। তিনিই তো সফল লেখক যিনি কাঁদাতে পারেন, আবার হাসাতেও পারেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নিজে যা ভাবেন অন্যকেও তা ভাবতে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখেন। জাদুকর ছাড়া আর কার আছে এই ক্ষমতা? কাজেই তিনি যদি জাদুকর না হবেন তাহলে আর কে আছে জাদুকর?